قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ
اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ
مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى
الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۚ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا
بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ
كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَاَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ
بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

সূরা মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৩৮

(১) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।—(ইবনুলমুনযির)

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়।—(রূহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বার বার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।—(বয়ানুল -কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে। كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى 'মূসার পরে' বলার কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা, মূসা (আঃ)-এর পর ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জীলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ – من অব্যয়টি আসলে 'কোন কোন'-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ, আল্লাহ্র হক মাফ হবে-বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ من অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

সূরা মুহাম্মদ

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে ''কিতাল'' তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢
ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣
فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ
اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۣ وَلَوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤
سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
اَقْدَامَكُمْ ۝٧ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١٠ ذٰلِكَ
بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

(২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। (৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে ! একথা শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসীগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। (৯) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নাই।

যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেনঃ হে মক্কা নগরী। জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিস্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এখানে سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্র পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ বলে কাফেরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম। যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাযত করা, উদারতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের এধরনের সৎকর্ম পরকালে তাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ – بال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া অন্তর ঠিক করে দেয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের দু'রকম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এই বিধান পূর্ববর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যতঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে

ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তাআলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্বিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ), হাসান, আতা (রহঃ), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্বিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহ্বিদ ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ একথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) -এর সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের গৃহীত মত এবং অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্বিদের অনুরূপ অর্থাৎ, মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন ঃ কুদূরী ও হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযমের এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েত 'সিয়ারে-কবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (রহঃ) ''মা'আনিউল-আসারে'' একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্বিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কেননা, কাফেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। অথবা কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন ঃ

ঃ মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবু ওবায়েদ (রহঃ)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে তো ফেকাহ্বিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (রহঃ) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা

করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। — (তফসীরে-কবীর, ৭ম খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল ! তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরায় সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষ ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় "আরবের তমদ্দুন" গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরূপে দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না। - - - কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃষ্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরাতুল-মা'আরেফ থেকে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর - হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে - হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোরও পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি রসূলে করীম (সাঃ) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। — (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে যে কোন ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, দু'জাহানের সরদার হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই ঃ الصلوٰة الصلوٰة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم অর্থাৎ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর।— (আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দাসদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রথাটি ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারেনা। ফেকাহ্র বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্যে বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, যেহারের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে,তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। — (মুসলিম) সাহাবায়ে

কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। "আন্নাজমুল ওয়াহ্হাজ" – এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) – ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) – ১০০, হযরত ওসমান গণী (রাঃ) – ২০, হযরত আব্বাস (রাঃ) – ৭০, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) – ১০০০, হযরত যুল কা'লা হিমইয়ারী (রাঃ)– ৮০০০ (মাত্র একদিনে), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) – ৩০,০০০ – (ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাত জন সাহাবী, ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না।

জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য ঃ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা, জেহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ, কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল-আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জেহাদ সিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জেহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের হেফাযতকারীদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না ; বরং অনেকের ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। জেহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয়পক্ষের অর্থাৎ, মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন ; অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না ; অর্থাৎ, তারা কিছু গোনাহ্ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্ তাকে হেদায়েত করবেন, (দুই) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত – উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জেহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্ তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। — (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে-মকসূদ' অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন ; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে ঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا অর্থাৎ, আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না ; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। — (মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

حم ٢٦ — ٥٠٩ — محمد ٤٧

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا
تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ
قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ
اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا
أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ
إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ
اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার ***অবস্থা নিম্নরূপ ঃ*** *তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? (১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে ঃ এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?*

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ – مَوْلَىٰ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কোরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ — এতে আল্লাহ্ তাআলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তাআলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয় ; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

اشراط শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন (সাঃ) –এর আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে কোরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্ হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছেন – নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কেয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত ঃ জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষেরা সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে ; এমন কি, পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এলেম হ্রাস পাবে এবং মুর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।— (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে।) এলমে-দ্বীন পার্থিব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে ; হীনতম ব্যক্তি জাতির

فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين و
المؤمنت والله يعلم متقلبكم ومثوىكم ﴿١٩﴾ ويقول الذين
امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها
القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر
المغشي عليه من الموت فاولى لهم ﴿٢٠﴾ طاعة وقول معروف
فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ﴿٢١﴾ فهل
عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ﴿٢٢﴾
اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ﴿٢٣﴾ افلا
يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ﴿٢٤﴾ ان الذين ارتدوا
على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطن سول لهم
واملى لهم ﴿٢٥﴾ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم
في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ﴿٢٦﴾ فكيف اذا توفتهم
الملئكة يضربون وجوههم وادبارهم ﴿٢٧﴾ ذلك بانهم اتبعوا
ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ﴿٢٨﴾ ام حسب
الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ﴿٢٩﴾

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (২০) যারা মুমিন, তারা বলে ঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্যে যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? (২৮) এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না?

প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে প্রোথিত হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কেয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মোতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি – فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك এতে এলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو আরও বলা হয়েছে ঃ سابقوا الى مغفرة من ربكم অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة এরপর বলা হয়েছে فاحذروهم এসব জায়গায় প্রথমে এলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর واستغفر অর্থাৎ, এস্তেগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলবিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে, ذنب তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়; যেমন সূরা আবাছায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাছায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝা যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে ঃ আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা

সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই।) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ – متقلب এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পালট হওয়া এবং مثوى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে متقلب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مثوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ – مُّحْكَمَةٌ এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই مُّحْكَمَةٌ কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় محكم শব্দটি منسوخ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে ''মুহকামাহ'' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব ''মুহকামাহ্'' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহ্কামাহ্ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে। — (কুরতুবী)

فَأَوْلَىٰ لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قاربه ما يهلكه অর্থাৎ, তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। — (কুরতুবী)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تولى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। (এক) মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও (দুই) কোন দলের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (রহঃ) বাহ্‌রে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও-(জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্যে জেহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যতঃ রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জেহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلَّىٰ শব্দের অর্থনেয়া হয়েছে ''রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা।'' এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হলে অর্থাৎ, দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ ঃ ارحام শব্দটি رحم এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رحم শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে তফসীরে রুহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, ارحام ও ذوى الارحام শব্দ কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও অন্য দু'জন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের বরাত দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই। — (আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ুবৃদ্ধি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বোখারীতে আছে ঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে ; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। — (ইবনে কাসীর)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) এই আয়াত দৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ, যে মালিকানধীন বাঁদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে,যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম। — (হাকেম)

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে خَتَمَ ও طَبَعَ অর্থাৎ, মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণতঃ বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু)

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। (এক) تسويل এর সুশোভিত করা ; অর্থাৎ, মন্দ বিষয়

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ
الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ
مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْــًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا
اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ
مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى
السَّلْمِ ۖۗ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ
اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْــَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ اِنْ يَّسْــَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا
وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

(৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (৩২) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের (সাঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধূলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেয়া। (দুই) املاء এর অর্থ অবকাশ দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ

اضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করত এবং বাহ্যতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে আলেমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযেহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা, এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বুঝতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। — (ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে,আল্লাহ্ তাআলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। মসনদে -আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক খোতবায় ছয়ত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর)

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ আল্লাহ্ তাআলা তো সৃষ্টির আদিকাল

থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। — (ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ এখানে "কর্ম বিনষ্ট" করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে – গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ কোরআন পাক এ স্থলে حبط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حبط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল ; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিস্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সৎকর্মের জন্যে অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ — অতএব, যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন ঃ بالرياء والسمعة মুকাতিল প্রমুখ বলেন ঃ بِالْمَنِّ কেননা, আহলে সুন্নত দলের ঐক্যমতে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্‌ও এমন নাই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায-রোযা বাতিল হয়ে গেছে— এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ্ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত ; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহ্‌র ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎকর্মে ও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না ; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে ; কিন্তু পরিণামে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিস্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তা নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِن جَنَحُوا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا সংসারাসক্তিই মানুষের জন্যে জেহাদে বাধাদান-কারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি,পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে

বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নেয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন ঃ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্যে চান না ; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই আয়াতেও يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত ঃ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উরায়নার উক্তি। — (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে — إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ - يحف শব্দটি احفاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমতঃ সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন— আল্লাহ্ তাআলার কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশতঃ অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব, বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চাননি। সমস্ত ধন-সম্পদ চাইলে তা স্বভাবতঃই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ - اضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এস্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেয়া মানুষের কাছে স্বভাবতঃই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছেঃ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করে না ; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তাআলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্যধর্মের হেফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! (সাঃ), তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না,) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। — (তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। — (তফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা)

।। সূরা মুহাম্মদ সমাপ্ত ।।